বিশ্বব্যাপী বোমা হামলা এবং বাংলাদেশ

প্রতিবন্ধিত্বের অন্যতম কারণ বোমা

লিখেছেন **সাইফুল হাসান** ও **হাসান মুর্তাজা**

রাহেলা, বানু আর কাশেমের জীবন আগের মতো নেই। রাহেলা কিংবা বানুর পক্ষে গার্মেন্টসের সেলাই মেশিনের চাকা ঘোরানো আর সম্ভব নয়। কাশেমও ভবিষ্যতে তার কোনো ক্রেতাকে জিনিসপত্র দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দিতে পারবে না।

২১ আগস্টের বোমা হামলা তাদের কর্মশক্তি কেড়ে নিয়েছে। রাহেলা ও বানু হারিয়েছে হাত। কাশেম চোখ।

তবুও ওরা ভাগ্যবান। নিহত ২০ জনের তালিকায় ওদের নাম নেই। একই হামলায় আহত হয়েছে দুই শতাধিক মানুষ। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছেন তারা। কিন্তু এদের অধিকাংশকেই বাকি জীবন কাটাতে হবে প্রতিবন্ধিত্বের বাস্তবতা মেনে নিয়ে।

এমন 'ভাগ্য' কি কারও কাম্য?

'৯৯ সালে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু। সর্বশেষ ঢাকার আওয়ামী লীগের সমাবেশ। পাঁচ বছরে ১৬টি বোমা হামলা। নিহত ১৪০। আহত ৯ শতাধিক। যারা মারা গেছেন, তারা হারিয়ে গেছেন চিরতরে। কিন্তু যারা আহত হয়ে প্রতিবন্ধী জীবনযাপন করছেন?

এখানে মাত্র ১৬টি বোমা হামলার খতিয়ান দেয়া হলো। কিন্তু দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য বোমা হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। এসব হামলায় কী পরিমাণ মানুষ প্রতিবন্ধী হয় তা সহজেই অনুমেয়।

GBme †M‡bW-†evgv †K‡o wb‡"Q gvb‡li
Rxeb Ges cwZeÜx Ki‡Q

শুধু বোমা হামলা নয়, প্রতিদিন অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছে নিরীহ মানুষজন। বোমা ছাড়াও নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয় এসব ঘটনায়। এসিড সন্ত্রাসও বাড়ছে দ্রুত হারে। প্রতি বছর প্রায় ৩৫০টি এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। এসিড সন্ত্রাসের অন্যতম শিকার নারী এবং শিশু, যাদের অধিকাংশই এসিডের কারণে প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে।

ঘাতকের পক্ষে বোমা কিংবা এসিড ছুঁড়ে মারা সহজ। কিন্তু এসব হামলার শিকার যারা হন, তাদের জীবনযাপন যে কতোটা কঠিন তা কি ঘাতকেরা ভেবে দেখে? একজন সুস্থ, সবল কর্মক্ষম মানুষের অক্ষম হয়ে যাওয়া মানে সমাজের গতিশীল চক্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি।

ব্যাপারটি নৈর্ব্যক্তিক নয়, সামগ্রিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্মক্ষম মানুষটি অচল হয়ে পড়ায় তার ওপর নির্ভরশীল পুরো পরিবারকে পথে বসতে হচ্ছে। রাহেলা, বানু কিংবা কাশেমের কথা চিন্তা করুন। তাদের উপার্জনে যে পরিবারটি চলতো, তাদের অবস্থাটি এখন কেমন?

সন্ত্রাসী এসিড নিক্ষেপ করলে মাত্র কয়েকজন মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু বোমা? বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে গ্রেনেড ব্যবহারের ভয়াবহতায় আমরা বুঝতে পারছি, যুদ্ধাক্রান্ত দেশগুলোর অবস্থা তাহলে কতোটা ভয়াবহ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে আমেরিকার ফেলা পারমাণবিক বোমায় কতো মানুষ নিহত হয়েছিলো তার হিসাব আমরা জানি। ইরাক, বসনিয়া, কুয়েত, আফগানিস্তানে হাজার হাজার টন বোমা পড়েছে এবং পড়ছে। সামরিক, বেসামরিক হাজার হাজার মানুষ মরছে সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করছে কয়েক গুণ বেশি মানুষ।

সন্ত্রাস এবং এর ফলশ্রুতিতে মানুষের প্রতিবন্ধিত্বের ব্যাপারটি বাংলাদেশের একক সমস্যা নয়। বোমা কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির শিকার হয়ে প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ মানুষ বিশ্বব্যাপী মারা যায়। প্রতিবন্ধী হয় ১৫ লাখ। বিশ্বে প্রতি মিনিটে একজন মানুষ মারা যান আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে। নিহত এবং আহতদের ৮০ ভাগই বেসামরিক লোকজন।

বিশ্বজুড়ে মানুষের প্রতিবন্ধিত্বের অন্যতম কারণ সশস্ত্র সংঘাত। যার অন্যতম উপাদান হলো বোমা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৫ শতাংশ বেসামরিক মানুষ মারা পড়েছিল। হাত-পা কিংবা দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি হারিয়ে প্রতিবন্ধী হয়েছিল প্রায় ১৫ লাখ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হার বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করেছিল প্রায় দেড় কোটি মানুষ। ১৯৯০-এর পর থেকে সমস্ত যুদ্ধে বেসামরিক মৃত্যু হার ৯০ শতাংশ। যুদ্ধে প্রতিবন্ধিত্ব বরণের হার প্রতি ৫ জনে ৩ জন। সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধেই কেবল প্রতিবন্ধী হয়েছে লক্ষাধিক বেসামরিক ইরাকি। এদের বড় অংশ নারী ও শিশু। অন্যদিকে, সোভিয়েতরা আফগানিস্তান ছেড়েছে ১৫ বছর আগে। কিন্তু এখনো আফগানিস্তানে প্রতি মাসে গড়ে ৮৮ জন মারা পড়ছে এবং ১৫০ জন আহত হচ্ছে সোভিয়েতদের পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে। ১৯৭৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মাইন বিস্ফোরণে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ মারা গেছে অথবা প্রতিবন্ধী হয়েছে। একই কারণে এঙ্গোলার প্রতি ৪৭০ জনে ১ জন পা-বিহীন।

যুদ্ধের কারণে যে কেবল বেসামরিক জনগণ প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করছে কিংবা মারা পড়ছে, তা নয়। সামরিক বাহিনীরও বড় একটা অংশ নিহত এবং আহত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ২ কোটি সৈন্য। এদের মধ্যে মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ছিল ২,৯২০০০। অন্যদিকে কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন সৈন্য নিহত হয় ৩৭ হাজার এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে ৫৮ হাজার। ১৯৫৭-৭৫ পর্যন্ত ভিয়েতনামের দু'অংশের মধ্যে চলা যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক প্রায় ৪০ লাখ লোক নিহত হয় অথবা প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। এ সংখ্যা তৎকালীন ভিয়েতনামের মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ।

উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ নেয়া মার্কিন সেনাদের প্রতি ৫ জনে ২ জন প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছে। যদিও সে সময় যুদ্ধক্ষেত্রে কেবলমাত্র ১৪৮ জন নিহত ও ৪৬৭ জন আহত হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে ক্ষতিকর ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ গোলা ব্যবহারের ফলে যুদ্ধফেরত সৈনিকদের শরীরে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ নেয়া ৫ লাখ ৪০ হাজার সৈন্যের মধ্যে ১ লাখ ৬১ হাজার সৈন্যই নানারকম প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হয়। এই বিপুল সংখ্যক সৈনিককে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভাতা দিতে বাধ্য হয়েছে। চিরদিনের জন্য উপসাগরীয় যুদ্ধের সৈনিকদের ১১ হাজার ইতিমধ্যেই মারা গেছে। চিরদিনের জন্য প্রতিবন্ধী হয়েছে ৩,২৫০০০ জন। অন্যদিকে, প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে ৭৫ হাজার থেকে ১ লাখ ইরাকি সৈন্য নিহত এবং ৩ লাখ আহত হয়। বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় ৩৫-৪৫ হাজার এবং আহত হয় কয়েক লাখ। আহতদের অধিকাংশই কম-বেশি প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হয়েছে। এবারও ইরাক যুদ্ধে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতি কম হচ্ছে না। এ পর্যন্ত ১০২৭ জন সেনা নিহত এবং ৭,১২৫ জন গুরুতর আহত হয়ে অকেজো হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে এবারের যুদ্ধে নিহত হয়েছে প্রায় ১ লাখ ইরাকি জনগণ। এছাড়া ১ বছরের মার্কিন দখলদারিত্বে গড়ে প্রতিদিন নিহত হয়েছে ৩৫ জন এবং আহত হয়ে প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হয়েছে ৮০ জন। এ সকল যুদ্ধের প্রতিটিতেই বোমা ছিলো প্রধান মারণাস্ত্র। যুদ্ধ এখন ঘোড় সওয়ার আর কামান তলোয়ারে সীমাবদ্ধ নয়। যুদ্ধ বিমান থেকে ফেলা একটি বোমা, ৫০০ আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও কার্যকর। যার ফল ভোগ করতে হয় যুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ দু'দলকেই। যুদ্ধরত দেশের যে জেতে তার হয়তো স্বার্থসিদ্ধি হয়, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ব্যাপক। আমেরিকা ইরাকে হাজার হাজার টন বোমা ফেলছে। যারা মারা যাচ্ছে তারচেয়ে কয়েক গুণ বেশি মানুষ প্রতিবন্ধিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে বিনা অপরাধেই। খুলনাতেই এ যাবৎকালে সংঘটিত বোমা হামলায় প্রতিবন্ধী হয়েছে ২১ জন। এরা জানতো না তাদের অপরাধ কী? বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই শান্তিপ্রিয়। তারা বোমায় আক্রান্ত পৃথিবী নয়, শান্তিপূর্ণ পৃথিবী দেখতে চায়।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ

বাংলাদেশের বোমা হামলা

তারিখ	স্থান	মৃত
৬-৩-১৯৯৯	উদীচী, যশোর	১০
৮-১০-১৯৯৯	আহাম্মদিয়া মসজিদ, খুলনা	৮
২০-১-২০০১	সিপিবি রেল এবং আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিস	৭
১৪-৪-২০০১	রমনা বটমূল, ঢাকা	১০
৩-৬-২০০১	বানিয়ারচর, গোপালগঞ্জ	১০
১৬-৬-২০০১	আওয়ামী লীগ অফিস, নারায়ণগঞ্জ	২২
২৩-১০-২০০১	আওয়ামী লীগ নির্বাচনী র‍্যালি, বাগেরহাট	৮
২৬-১০-২০০১	আওয়ামী লীগ জনসভা, সুনামগঞ্জ	৪
২৮-১০-২০০২	সিনেমা হল, সাতক্ষীরা	৩
৬-১২-২০০২	৪টি সিনেমা হল, ময়মনসিংহ	২১
১৭-১-২০০৩	ফায়লা পীর মাজার, টাঙ্গাইল	৭
১২-১-২০০৪	শাহজালাল মাজার, সিলেট	৫
২১-৫-২০০৪	শাহজালাল মাজার, সিলেট	৩
৫-৮-২০০৪	দুই সিনেমা হল, সিলেট	১
৭-৮-২০০৪	আওয়ামী লীগ সভা, সিলেট	১
২১-৮-২০০৪	আওয়ামী লীগ র‍্যালি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	১৯

Z_¨mÎ : †WB‖j ÷vi

সহিংসতায় ব্যবহৃত বোমা এবং অস্ত্রশস্ত্রের অধিকাংশই এসেছে বিদেশ থেকে। বিশ্বজুড়ে ছোট অস্ত্র এবং বোমার এক রমরমা ব্যবসা চলছে। কালোবাজারে ছোট অস্ত্রের ব্যবসার পরিমাণ বছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার। বিশ্বের ৯৮টি দেশের অন্তত ১১৩৪টি কোম্পানি এই ক্ষুদ্র অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরি এবং বিক্রির সঙ্গে জড়িত। মোট কথা, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আজ আর দুষ্প্রাপ্য জিনিস নয়। চাইলেই সংগ্রহ করা যায়। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভারত ও মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন চলছে এমন রাজ্যগুলোর সংলগ্ন। এসব রাজ্যের স্বাধীনতাকামীরা কালোবাজারে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, বহুদিন ধরে বাংলাদেশ অস্ত্র চোরাকারবারীদের ট্রানজিট রুট। এক সময় অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গ্রেনেড, গোলাবারুদ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পরিবাহিত হয়ে ভিন্ন দেশে যেতো। এখন স্থানীয় সন্ত্রাসীরা নিজেরাই এসব অস্ত্র সংগ্রহ করছে এবং দেশে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সহিংসতার কারণে মানুষের মৃত্যুহার এবং একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী হয়ে যাবার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসিড সন্ত্রাসের মতো অপরাধ তৎপরতাও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চলছে। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হবার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২-এ এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান থাকলেও এই অপরাধ কমছে না। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে মূলত নারীরা। এসিড নিক্ষেপের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর হার বেশি না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে প্রতিবন্ধিত্ব মেনে নিতে হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০০ সালে বাংলাদেশে এসিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২২৬ জন, ২০০১ সালে ৩৪৩ জন, ২০০২ সালে ৪৮৪ জন, ২০০৩ সালে ৪১০ জন এবং ২০০৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এ সংখ্যা ২১৪ জন (সূত্র : প্রথম আলো)। অর্থাৎ, ২০০০-২০০৩ সাল পর্যন্ত ৪ বছরে গড়ে প্রতি বছর ৩৬৫ জন এসিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

সহিংসতা প্রতিবন্ধিত্বের অন্যতম কারণ। যা পুরো বিশ্বের জন্য উদ্বেগজনক। এ রিপোর্টের শুরুতেই আমরা কয়েকজন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। সারা দেশ থেকে আমাদের রিপোর্টাররা জানিয়েছেন, বোমা বা গ্রেনেড হামলায় আক্রান্ত মানুষের বেঁচে থাকার নির্মম অভিজ্ঞতা। বিশ্বব্যাপী বোমা উৎপাদন বন্ধ করা উচিত। যা জীবন কেড়ে নেয়, জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয় বিবেকবান মানব সমাজ, সেটা উৎপাদনে সায় দেবে কেন? বাংলাদেশের সরকার ও আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতায় বারবার বোমা হামলা ঘটছে। বিশ্বব্যাপী এমন চোরাগোপ্তা বোমা হামলা চলমান। অথচ প্রতিটি রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের জীবনের নিশ্চয়তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে যারা বিশ্বব্যাপী বোমা ব্যবহার করছে তারা শুধু হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞই চালাচ্ছে তাই নয়- বরং প্রতিবন্ধিত্বও সৃষ্টি করছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা কতোটা কষ্টসাধ্য তা বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো তাদের দশ বছরের আন্দোলনে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। উন্নত বিশ্বে রাষ্ট্র খুব বেশি বৈষম্য না করলেও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবন কতোটা কষ্টের তা প্রতিবন্ধী মাত্রই বোঝে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বোমায় যখন লাখ লাখ মানুষ মারা যায়, তারও বেশি মানুষ জীবনের স্বাভাবিকত্ব হারায় তখন কি বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নও পিছিয়ে পড়ছে না? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। জীবন থেমে থাকার নয়। মানুষ থেমে থাকে না। প্রতিবন্ধীরাও থেমে নেই। উন্নত জীবনের সংগ্রামে তারা অবিচল-অতন্দ্র। কিন্তু যারা মানুষকে প্রতিবন্ধী করছে তাদের কি আমরা ক্ষমা করে দেবো? উত্তর হলো- না। সাধারণ মানুষের হাতে বোমা নেই। আগ্নেয়াস্ত্রও নেই।

আছে প্রতিবাদ প্রতিরোধের শক্তি। দৃঢ় কণ্ঠ ন্যায়বিচারের দাবির। সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার বাস্তবায়নের লড়াইয়ের স্পৃহা। এ সময় প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, ঐকমত্যে পৌঁছানোর, যাতে আদায় হয় দাবি, প্রতিষ্ঠিত হয় অধিকার।

সূত্র : ইন্টারনেট ও বিভিন্ন পত্রিকা

বাংলাদেশে বোমা হামলা

কেমন আছে প্রতিবন্ধী মানুষগুলো

wewfb †Rjvq AbmÜvb K‡i‡Qb gvgb ingvb, wbRvgj nK wecj, cviwfb Zwb, iweDj Avjg

বোমার কারণে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ২ শতাধিক। এদের সবার খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়নি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন বোমা হামলায় প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া মানুষগুলো কেমন আছে

হাসিখুশি মানুষ আবুল খায়ের। ঢাকার ভাসানটেকের বাসিন্দা। পেশায় ব্যবসায়ী। পাঁচ ছেলেমেয়ের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় উপার্জনশীল ব্যক্তি আবুল খায়ের আজ প্রতিবন্ধী। হামলায় তার একটি পা অচল হয়ে গেছে। পরিবারের কথা উঠতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তার অবর্তমানে সংসার কিভাবে চলছে তা তিনি জানেন না। প্রতিবেশীরা যদিও সাহায্য করছে, কিন্তু কতো দিন? তার তিন বছরের সন্তানটি এখনো জানে না ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় তার বাবার কি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। রোজগারের একমাত্র ব্যক্তি হওয়ায় নিজের পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আবুল খায়ের চিন্তায় বিপর্যস্ত।

গেন্ডারিয়ার বাসিন্দা শরিফ হোসেন খোকন। উৎসাহ নিয়ে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের জনসভায়। সুস্থ স্বাভাবিক খোকন জনসভা শেষে বাসায় নয়, ফিরলেন হাসপাতালে। গ্রেনেড হামলায় পায়ে মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন তিনি। পায়ের তালু ফেটে গেছে তার। অন্য পায়ের উরু থেকে মাংস এনে জোড়া লাগাতে হয়েছে পায়ের পাতা। বিস্ফোরণের প্রচন্ড আওয়াজে কানে এখনও প্রায় কিছুই শোনেন না। সুস্থ হয়ে কবে বাসায় ফিরে যাবেন? আদৌ সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন কি না তা অনিশ্চিত। খোকনও তার সংসারে একমাত্র রোজগারের মানুষ। ব্যবসা করে সংসার চালাতে হয় তাকে। বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ। কোনো রকমে সংসার চলছে। কবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন ঠিক নেই। কবে আবার

ব্যবসা শুরু করবেন সেটাই বা কে জানে। কখনো ভালোমতো শুনতে পাবেন কি না তাও জানেন না।

আবুল খায়ের বা খোকনের মতো কারও চোখ নেই, কারও নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গেছে। কেউবা হারিয়েছে দুটো হাত। শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি তাদের জীবনে এসেছে এক অনিশ্চয়তা- সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেন কি? ঢাকায় ২১ আগস্ট বোমা হামলায় অনেক মানুষ গুরুতর আহত হলেও হাসপাতাল খুঁজে মাত্র এই দু'জনকে পাওয়া গেছে। বাকিদের খবর পাওয়া যায়নি।

D`xPx tevgv nvgjvq cwZeÜx n‡q †M‡Qb mKv‡š

বিগত ৫ বছরে খুলনা নগরীতে সংঘটিত ছোট বড় শতাধিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় প্রতিবন্ধী হয়েছে ২১ জন। নিহত হয়েছে ২৩ জন। আহত দুই শতাধিক।

বোমায় প্রতিবন্ধী : যেমন চলছে জীবন

খুলনায় প্রথম বোমা বিস্ফোরণের প্রথম ঘটনা ঘটে '৯৯ সালের ৮ অক্টোবর দুপুরে। নগরীর নিরালা আহমাদিয়া জামায়াত মসজিদে। যশোরের উদীচী বোমা ট্র্যাজেডির (৪ মার্চ '৯৯) পর মসজিদের ভেতর এ জঘন্য পৈশাচিক ঘটনা নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে আসা ৭ মুসল্লি সন্ত্রাসীদের পেতে রাখা বোমাঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। আহত হন ৩০ জনের বেশি। আহমাদিয়া জামায়াতের সেক্রেটারি আহসান জামিল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ঐ ঘটনায় আহতদের মধ্যে ৬ জন এখন প্রতিবন্ধীর জীবন যাপন করছেন। তারা হলেন- ইমদাদুর রহমান (৫৫), আব্দুল ওয়াজেদ (৫৫), ওমর ফারুক (৫০), আব্দুর রাজ্জাক (৪৮), নুরুল্লাহ (৫৫), শেখ মোহাইমোল (২৮)।

মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় প্রতিবন্ধী ইমদাদুর রহমান জানান, 'বোমার স্প্লিন্টারে তার ডান পা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।' চার মেয়ে, দুই ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে তার পরিবার। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ায় গত ৫ বছর ধরে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন তিনি এবং তার পরিবার। ইমদাদের স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার। কিন্তু এখন এটা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারের নিত্যদিনের টানাপড়েনের মধ্যে দুমুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই তিনি খুশি।

ধর্মীয় শিক্ষক আব্দুল ওয়াজেদ দুই পায়ের পাতা হারিয়ে চলাফেরা তো করতে পারেনই না, উপরন্তু পা ভাঁজ করে নামাজ পর্যন্ত আদায় করতে পারেন না। দুই ছেলে, এক মেয়ে আর স্ত্রীসহ ওয়াজেদকে এখন অন্যের অনুগ্রহ নিয়ে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে। পুলিশের বড় কর্তা হওয়ার স্বপ্ন ছিল ছাত্র মোহাইমোলের। কিন্তু প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ায় তা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। ওমর ফারুক একটা সমিতিতে চাকরি করতেন। স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই ছিলেন। কিন্তু বোমার স্প্লিন্টারে তার হাতের আঙুলগুলো উড়ে গেছে। গলার মধ্যে ঢুকে রয়েছে স্প্লিন্টার। ৫ বছর ধরে বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। সারাক্ষণ কাশি লেগে আছে তার। যন্ত্রণাকাতর ওমর ফারুক জানান, ওষুধ কেনার মতো অর্থ তার কাছে নেই। কাজ করতে না পারায় সমিতির চাকরিটাও চলে গেছে বেশ আগেই। অনিশ্চয়তার মধ্যে তার জীবন কাটছে- ডান পা হারিয়ে আব্দুর রাজ্জাকও একই রকম জীবন কাটাচ্ছেন।

tevgvq `ûcv nviv‡bv bvwn`

'৯৯ সালে খুলনা নগরীতে কাদিয়ানিদের মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের সূচনা ঘটলেও সম্প্রতি এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। কয়লা শ্রমিক জাহিদ হোসেন (২৯) ২০০০কে বলেন, তিনি গত ১৩ আগস্ট স্যার ইকবাল রোডে কয়লার কাজ করার সময় তার পায়ের ওপর এসে বোমা পড়ে। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তার ডান পা। দিনমজুর জাহিদ এখন পুলিশের তত্ত্বাবধানে খুলনা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। ৫ সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম জাহিদ এখন প্রতিবন্ধী। হাসপাতালের বেডে শুয়ে অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতের প্রহর গুনছেন তিনি। মাস দেড়েক আগে মহানগর বিএনপির সহ-সভাপতি সেকেন্দার জাফর উল্লাহ খান সাচ্চু বাসা থেকে যাচ্ছিলেন কেডিএ'র পার্টি অফিসের উদ্দেশে। হঠাৎ বোমা এসে পড়ে তার ওপর। এ যাত্রায় প্রাণ রক্ষা পেলেও বোমার স্প্লিন্টারে উড়ে যায় তার হাত। সিটিএসবির একজন কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, 'সোনাডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই সরোয়াদ্দীন নগরীর শেখপাড়ায় কর্তব্য পালন করছিলেন। হঠাৎ তাদের ওপর সন্ত্রাসীরা বোমা ছোড়ে। বোমাঘাতে সরোয়ার বাম হাত হারান।' পৃথক বোমা হামলায় ডান পা হারান কনস্টেবল মনিরুল ইসলাম। এ ঘটনার পর চাকরি হারিয়ে তারা এখন অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু প্রতিবন্ধীর জীবন কাটাচ্ছেন।

সন্ত্রাসীদের নিক্ষিপ্ত বোমাঘাতে কেবল আহত আর প্রতিবন্ধীই হচ্ছে তা নয়, মারা যাচ্ছে বহু লোক। খুলনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বোমা হামলায় '৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালু, মানিক সাহা, আওয়ামী লীগ নেতা এ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম, বিজন বিহারী মন্ডল, কামরুল ইসলাম টুকু, রিকশাচালক সাহিদুল রহমান, নজরুল ইসলাম, ফজলুর রহমান, সার্জেন্ট আরিফুর রহমান, পুলিশ কনস্টেবল রমেশ, শরিফুল, সুবেদার আশরাফ এবং আহমাদিয়া জামায়াতের ৭ জন। এসব ঘটনায় দেশব্যাপী তোলপাড় হলেও নিহত এবং প্রতিবন্ধীত্ববরণকারীদের এবং তাদের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে পরে কেউ খোঁজখবর নেয় না। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোঃ সাজ্জাদ আলী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বোমাঘাতে নিহত এবং প্রতিবন্ধীত্ববরণকারীদের সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সহায়তা দেয়া সম্ভব হয় আমরা তার পুরোটাই দিয়ে যাচ্ছি। ৯ মাস হলো আমি খুলনায় এসেছি। এ সময় বোমাঘাতে এক পুলিশসহ ১২ জন মারা গেছে। আমাদের একজন পুলিশসহ বেশ কয়েকজন প্রতিবন্ধী হয়েছে বলে আমি জেনেছি। তাদের যথাসম্ভব আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।'

প্রতিবন্ধী হওয়া মানুষগুলোর খবর কেউ রাখে না

সুদর্শন যুবক সুকান্ত দাসের গিটারে এখন আর সুর ওঠে না। বয়সের কারণে চোখে-মুখে উচ্ছলতা আর চাঞ্চল্য লেগে থাকলেও প্রাণ নেই। কেমন আছেন জানতে চাইলে সহাস্য জবাব মিললেও তাতে যেন বেদনা আর হতাশাই প্রকাশ পায়। যশোর এমএম কলেজের মাস্টার্সের (ম্যানেজমেন্ট) ছাত্র সুকান্ত দাস সাড়ে ৫ বছর আগে চিরতরে

প্রতিবন্ধী হয়ে যান। '৯৯ সালের ৬ মার্চ রাতে যশোর টাউনহল ময়দানে উদীচীর অনুষ্ঠানে যে বর্বর বোমা হামলা হয়েছিল, তাতে গুরুতর জখম হন তরুণ সুকান্ত। অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ডান পা শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়। আর উড়ে যায় ডান হাতের উপরিভাগের মাংসপিন্ড। আঘাতের ভয়াবহতা বেঁচে থাকা নিয়ে চিকিৎসক আর স্বজনরা সংশয়ে থাকলেও অনেকটা মনের জোর আর ভাগ্যগুণে বেঁচে যান সুকান্ত দাস। তবে এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় তাকে। অন্তত ৫ মাস চিকিৎসা করাতে হয় ঢাকার প্রতিবন্ধী আর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে। হাতের উড়ে যাওয়া মাংসপিন্ডের ক্ষত সারাতে ৩-৪ বার যেতে হয় ভারতে।

উড়ে যাওয়া পায়ের একটি বিকল্প পা সংযোজন করে দেয় সরকার। তার ওপর ভর করেই এখনো হাঁটাচলা করেন সুকান্ত দাস। কিন্তু সাড়ে ৫ বছরে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়েছে কৃত্রিম ঐ পায়ে। যার মেরামত না করালে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যাবে সুকান্তের। কিন্তু সে খবর এখন আর কেউ রাখে না। কেউ জানতে চায় না কেমন আছেন তিনি এবং তার পরিবার। প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার পর আত্মীয়স্বজন আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে যে ৫০ হাজার টাকা তারা ধার করেছিলেন সাড়ে ৫ বছরে তা শোধ করতে পারেননি। তার ওপর দু'বার অন্তত ১২ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে কৃত্রিম পা'র মেরামত কাজে। বেদনার্ত সুকান্তর সরল অভিব্যক্তি। 'পা না ঠিক-করলে যে জীবনটাই প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে। ওর ওপর ভর করেই যে এখনো একবুক স্বপ্ন লালন-পালন করছি। সে স্বপ্ন মানুষ হওয়ার। আমার বৃদ্ধ মা-বাবার মুখে হাসি ফুটানোর। আর সে জন্যই তো নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যদেরও পড়াই। যা আয় হয় তা দিয়ে আমার খরচ চলে যায়। দেখি মাস্টার্স শেষ করার পর যদি কোনো চাকরি পেয়ে যাই তাহলে কষ্টটা সার্থক হবে।'

সুকান্ত দাস যশোর শহরের নীলগঞ্জ তাঁতিপাড়ার গোপীনাথ দাসের ছেলে। ৪ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। অভাবী পরিবারে একমাত্র তার এক ভাই-ই উপার্জনক্ষম। পিতা বয়সের ভারে ন্যূজ। এ অবস্থায় আর তাকে নিয়ে সবাই স্বপ্ন দেখতো, ৬ মার্চের ঘটনার পর তাদের বুক ভেঙে যায়। বরং সুকান্তের কী হবে সে চিন্তাই হয়ে ওঠে মুখ্য। কিন্ত সুকান্ত ভেঙে পড়েননি। হায়েনা চক্র এ দেশের প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে বর্বরতা চালাচ্ছে সুকান্ত অনেকটা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় নিয়েই ঘুরে দাঁড়ান। প্রতিবন্ধীত্ব তার চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করলেও রুখে দিতে পারেনি। ২০০০কে সুকান্ত জানান, 'যখন বোমা হামলার শিকার হই তখন আমি অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। ডান হাতের মাংস উড়ে যাওয়ায় লিখতে পারতাম না। তার পরও আশা ছাড়িনি। বাম হাত দিয়ে লিখেই আমি পরীক্ষা দেই। এভাবে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত বাম হাত দিয়েই লিখেছি। একই কারণে গিটার বাজানোও বন্ধ হয়ে যায়। তবে হাতের অবস্থা আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে।' অনেকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই সুকান্ত বলেন, 'হয়তো আমি আবার ভালোভাবে গিটার বাজাতে পারবো। জানেন, গিটার বাজানো প্রতিযোগিতায় আমি এক সময় সারা দেশে ফার্স্ট হয়েছিলাম।' তবে পাশে রাখা ক্র্যাচটির দিকে তাকিয়ে সুকান্ত যেন ম্লান হয়ে যান। কিছু

21 AvM÷ †evgv nvgjvi ci Gfv‡eB iv¯Ívq c‡oÑQj AvnZ gvbl, fwel¨‡Z †m m¯ Rxeb wd‡i cv‡e wKbv Zvi †Kv‡bv wbðqZv †bB

না বললেও বোঝা যায়। সুকান্তর বেদনা, 'আমি আর আগের মতো হাঁটতে পারবো না।' তবে প্রচন্ড বাস্তববাদী আর প্রাণশক্তি সুকান্তর। বর্তমানে কেউ তাদের খোঁজ না নেয়াতেও যেন কোনো আফসোস নেই তার। প্রশ্ন করতেই পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন সুকান্ত, 'কে খবর নেবে। যারা খবর নেবে তারা কী ভালো আছে? নিজেদের জীবন বাঁচাতেই তো তাদের এখন ত্রাহি অবস্থা।'

সুকান্ত অনেক বাস্তববাদী আর দৃঢ়চেতা হলেও এর একেবারে উল্টো আরেক হতভাগ্য যুবক ইকবাল কবির নাহিদ। সুকান্তের একটি পা থাকলেও নাহিদের তাও নেই। নাহিদ জানান, 'প্রতিবন্ধী হয়েছি সাড়ে ৫ বছর। ঐ সময় এককালীন ২৫ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। তা দিয়ে একটি চা স্টল দিয়েছিলাম বাস টার্মিনালে। কিন্তু টার্মিনাল স্থানান্তর হয়ে যাওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সম্পূর্ণ বেকার।' পাশে বসে থাকা নাহিদের বৃদ্ধ মা কেঁদেই ফেলেন। বলেন, 'আমার নাহিদের কী হবে ও কি করে খাবে? কেউ তো আমাদের খোঁজ নেয় না! সরকার ওর যে পা বানিয়ে দিয়েছিল তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুনেছি ঠিক করতে অনেক টাকা লাগবে। কোথায় পাব আমরা তত টাকা! আমার নাহিদের যে এমন অবস্থা হবে আমি ভাবতেও পারিনি। ওর তো কোনো দোষ ছিল না। গান ভালোবাসতো। তাই ছুটে গিয়েছিল টাউন হলের মাঠে। নাহিদের মতো বোমার আঘাতে যাদের প্রতিবন্ধী হতে হলো তাদের কি বিচার হবে না? বিচার হলেও তো সান্ত্বনা থাকতো।' সেদিনের সেই নারকীয় ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে নাহিদ জানান, 'আমি ছিলাম মঞ্চের একেবারে পাশে। এখন ভাবি, আমি মনে হয় বোমার উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কারণ আমার দু'পাই উড়ে গেছে। একটি পা উড়ে গিয়ে ঝুলে ছিল পাশের একটি গাছে। কেন যে সেদিন মরে যাইনি। তাহলে আজকের এ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না। কৃত্রিম পা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেটে ফেলা দু'পায়েই মাঝে মাঝে ব্যথা করে। এমন দুর্ভাগ্য আর করুণ পরিণতি যেন আর কারো না হয়।' প্রতিবন্ধী হওয়ার পর অনেকে অনেক আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন আর কেউ খোঁজও করেন না। একই অভিযোগ করেন বোমা হামলায় প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া আরেক ব্যক্তি বাদল কুমার দাস। সুকান্ত আর জাহিদের মতো তার পা উড়ে না গেলেও তিনিও গুরুতর জখম হয়েছিলেন। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তার এক পা। এখনো যখন একা থাকেন তখন সেই বর্বরতার ছবি ফুটে ওঠে তার মনে। স্ত্রী, সন্তান আর বাপ-ভাইয়ের পরিবারের খরচ চালিয়ে লাখ টাকা জোগাড় করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বোমা হামলায় মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া বাদলের একটি পা চিকিৎসায় ভালো হলেও তিনি স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারেন না। পারেন না ঐ পাটি ভাঁজ করতেও। বাদল বলেন, 'ঢাকা প্রতিবন্ধী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফেরার পর প্রশিকা ২০ হাজার টাকা দিয়েছিল।

†evgvq Avµvš GKRb : GB gvbl‡Ui fwel¨Z Awb‡ðZ

ও পর্যন্তই। আর কেউ কোনো খোঁজখবর নেয়নি। আসলে কে কার খবর রাখে।' এ যন্ত্রণাটিই কুরে কুরে খাচ্ছে আরেক যুবক মনোয়ার আলম মনুকে। মনুর হাত-পা উড়ে না গেলেও সুকান্ত, নাহিদ, আর বাদলের চেয়ে তার অবস্থাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। তাকে কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব না ভেবে চিকিৎসকরা তাকে হাসপাতালের বারান্দায় বিনা চিকিৎসায় ফেলেই রেখেছিলেন। বোমায় আহত হওয়া ছাড়াও মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তার পেটে। অন্তত ৪টি নাড়ি ছিঁড়ে যায় তার। ঐ রাতেই তাকে নেয়া হয় খুলনা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা দেয়ার পর পাঠানো হয় ঢাকায়। মনু বলেন, 'অনেকটা মানসিক আর ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছি। তবে এ জীবন দুর্বিষহ। এখনো পেটে ব্যথা করে, বমি হয়, শরীর প্রচন্ড দুর্বল। কাজ করতে পারি না। এক ভাইয়ের স্টুডিওতে বসি, যা দেয় তা দিয়ে সংসার চলে না। স্ত্রী আর দু সন্তান নিয়ে কীভাবে বেঁচে আছি সে খবরও কেউ নেয় না। অথচ আমার চিকিৎসা আর কর্মসংস্থান যে কত জরুরি, তা কেবল আমিই অনুভব করি।' মনুর আরেকটি পরিচয় হলো তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত ফটো সাংবাদিক প্রয়াত এস এম শফির ছেলে। মনুর পায়ের ক্ষত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, সেখানে কোনো হাড়ই ছিল না।

আহত এবং প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া সুকান্ত, নাহিদ, বাদল আর মনুর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সুচিকিৎসা পেলে তাদের জীবন যাপন আরো সহজ হতো। দুর্বিষহ অবস্থার বহুলাংশে অবসান ঘটতো। কিন্তু তাদের কারোরই সে সামর্থ্য নেই। এ প্রসঙ্গে উদীচী যশোরের সহ-সভাপতি ও সাবেক সম্পাদক অধ্যাপক সুকুমার দাস ২০০০কে বলেন, 'আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, আমরা তা করেছি। আর কিইবা করার আছে। আহতদের মোট ৫ লাখ টাকা দিয়েছিল প্রশিকা। আর প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম পা সংযোজন করে দিয়েছিল তৎকালীন সরকার। আমরা ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলাম। তেমন সুযোগ যদি আসে উচীচী আবার তা করবে।' কিন্তু সেই সুযোগটি কোথায়? দিনে দিনে প্রতিবন্ধী হওয়া মানুষের সংখ্যা যে বাড়ছে।

জিতু-জমির : বেঁচে থাকাটাই সান্ত্বনা

জিতুর পুরো নাম জিতেন্দ্র মোহন দাস জিতু। বয়স ২৮ বছর। থাকেন সিলেট মহানগরীর কুয়ারপাড় এলাকার একটি ভাড়া বাসায়। নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ির ঘোষানপুরের যুবক জিতু গত ৭ আগস্ট সিলেট শহরের তালতলা এলাকার গুলশান সেন্টারে গ্রেনেড হামলার ঘটনায় আক্রান্ত হন। গ্রেনেড হামলার সময় জিতু গুলশান সেন্টারের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা তার সমস্ত শরীরে এসে বিদ্ধ হয় গ্রেনেডের অসংখ্য স্প্লিন্টার।

সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে সম্প্রতি জিতু তার যন্ত্রণার কথা জানিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'তার বাম হাত অবশ হয়ে গেছে। তিনি আর কোনো কাজ করতে পারবেন না। জিতু বলেন, চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন যত দ্রুত সম্ভব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার জন্য। কিন্তু ভালো চিকিৎসা নিতে প্রয়োজন প্রচুর টাকার।' এ টাকা তিনি পাবেন কোথায়-বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। পাশে বসা জিতুর মা বিনোদিনী দাস। তার চোখে-মুখে রাজ্যের অন্ধকার। বিনোদিনী দাস বলেন, 'ছেলের চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে গ্রামের বাড়ির ৩০ শতক জমি বিক্রি করেছি। উপার্জনক্ষম একমাত্র সন্তানের করুণ পরিণতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য জিতুকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার মতো টাকা আমার নেই।'

সিলেট শহরের রং মহল সিনেমা হলের সামনের পান দোকানি জমির আলী আহত হয়েছেন ৫ আগস্ট। ওই দিন সিনেমা হলের সামনে বোমা বিস্ফোরিত হলে স্প্লিন্টারের আঘাতে জমির আলীর ডানহাতের অর্ধেক অবশ হয়ে যায়।

প্রায় প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া জমির আলীর বর্তমান অবস্থা জানতে নগরীর কাজল শাহ এলাকায় তার ভাড়া বাসায় গেলে তার মেয়ে লায়লা ও নাজমা ২০০০কে জানায়, 'বোমা তাদের পরিবারের সব সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছে।'

বোমার আঘাতে তাদের বাবার শরীরের পুরো বাম অংশ অবশ হয়ে গেছে। পান দোকানের ওপর নির্ভরশীল জমির আলী প্রথম কিছুদিন ধার-দেনা করে চিকিৎসা করালেও কিছুদিন আগে হাসপাতাল ছেড়ে চলে এসেছেন। দুই মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে জানায়, তাদের সংসারে বর্তমানে চরম দৈন্য যাচ্ছে। বাবার চিকিৎসা করার মতো অর্থ তাদের কাছে নেই। তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ কি? বাবার চিকিৎসাই বা কিভাবে হবে? তার কিছুই জানে না তারা।

সারা দেশ থেকে মাত্র কয়েকজনের খবর আমরা জেনেছি। এর বাইরেও বোমায় Avµvš অনেক প্রতিবন্ধী রয়েছেন। বোমার আঘাতে প্রতিবন্ধিত্ব বরণকারীরা প্রত্যেকেই নিরপরাধ। কিন্তু ঘাতকের বোমা তাদের প্রতিবন্ধী করেছে। বোমায় আক্রান্তরা মাঝে মাঝেই একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন, 'কি অপরাধ ছিলো তাদের? কেন তাদের প্রতিবন্ধিত্বের দিকে ঠেলে দেয়া হলো। এর কোনো উত্তর নেই। প্রতিবন্ধী হলেও তারা থেমে নেই। কারণ জীবনযোদ্ধা এসব মানুষ জানে কিভাবে এগিয়ে যেতে হয়। যদিও নির্মম বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার অপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি পর্যায়ে তারা নির্যাতনের শিকার। এ পর্যায়ে এই মানুষগুলোর জীবন যারা বিপদসংকুল করলো তাদের কি বিচার হবে না? আজ বা আগামীকালই হয়তো বিচার হবে না। কিন্তু একদিন হবেই। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী যেমন জাগছে তাতেই আশান্বিত হচ্ছে বোমায় প্রতিবন্ধী মানুষগুলো। তাদের পাশে কি আমরা দাঁড়াবো না? বোমা হামলায় প্রতিবন্ধী মানুষগুলো আশা প্রকাশ করেছে কষ্ট হলেও তারা ঠিকই সামনে এগিয়ে যাবে।

আসুন আমরা সকলে বোমাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। যারা বোমার সাহায্যে মানুষ হত্যা করছে আর প্রতিবন্ধী করে দিচ্ছে তাদের বিচার চেয়ে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করি।

Action on Disability and Development ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিশেষ উদ্যোগ